'পদ্মাবত' উপাখ্যানের উৎস

সৈয়দ আলী আহসান

'পদ্মাবত'-এর কাহিনীর উৎস কোথায় তা যথাযথভাবে আবিষ্কার করা কঠিন। কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের কথা আছে অর্থাৎ ইতিহাস প্রসিদ্ধ কয়েকজন ব্যক্তির উল্লেখ আছে। সম্পূর্ণ আখ্যায়িকাকে আমরা যদি দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে ইতিহাস এবং কল্পনার বিন্যাস ও সংযোগ দেখতে পাই। রত্নসেনের সিংহল যাত্রা থেকে আরম্ভ করে পদ্মিনীকে নিয়ে চিতোর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনীর পূর্বার্ধ গণনা করা যায়। রাঘবচেতনের বহিষ্কার থেকে আরম্ভ করে পদ্মিনীর সতী হওয়া পর্যন্ত উত্তরার্ধ। কাহিনী অনুসরণ করলে দেখতে পাব যে পূর্বার্ধ সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। ইতিহাসের ব্যক্তি এ অংশে আছে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ অঞ্চলের নামও পাই, কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা নেই। উত্তরার্ধে ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস আছে, যাকে বলা যায় ঐতিহাসিক আধার। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ সম্পর্কে টডের রাজস্থান গ্রন্থে[১] নিম্নলিখিত বিবরণ আছে :—

> "বিক্রম সংবৎ ১৩৩১ সালে লখনসী চিতোরের সিংহাসনে বসেন। ইনি নাবালক ছিলেন বলে এর পিতৃব্য ভীমসী রাজ্যশাসন করতেন। ভীমসীর বিবাহ হয়েছিলো সিংহলের চৌহান রাজা হম্মীর শংকের কন্যা পদ্মিনীর সঙ্গে। পদ্মিনী রূপে গুণে জগতের অদ্বিতীয়া ছিলেন। পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি শুনে দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীন চিতোর গড় আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আলাউদ্দীন সন্ধি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি একবার মাত্র গড়ের ভিতরে প্রবেশ করে পদ্মিনীর রূপ দর্শন করতে চান। তারপর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করবেন।

ভীমসী বলেন যে আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে প্রত্যক্ষে দেখবেন না, দর্পণে তার ছায়ামাত্র দেখবেন। যুদ্ধ বন্ধ হলো এবং আলাউদ্দীন অল্প সংখ্যক সামন্ত নিয়ে চিতোর গড়ের ভিতর প্রবেশ করলেন। দর্পণে পদ্মিনী দর্শনের পর আলাউদ্দীন যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন ভীমসী আলাউদ্দীনের সঙ্গে হেঁটে গড়ের বাইরে এলেন। বাইরে আলাউদ্দীনের অনেক সৈন্য অপেক্ষা করছিলো। বাইরে আসা মাত্রই আলাউদ্দীনের সৈন্যদের হাতে রাজা বন্দী হলেন এবং বন্দী অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হলো মুসলমানদের শিবিরে। আলাউদ্দীন ঘোষণা করলেন যে, পদ্মিনীকে না পেলে তিনি রাজাকে মুক্তি দেবেন না। এ সংবাদ যখন পদ্মিনী পেলেন তখন তিনি গোরা এবং বাদলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। গোরা ছিলেন তাঁর পিতৃব্য এবং বাদল গোরার ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁরা যুক্তি করলেন কি করে রাজাকে উদ্ধার করা যায়। আলাউদ্দীনকে জানানো হলো যে পদ্মিনী তাঁর কাছে যেতে প্রস্তুত কিন্তু উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে। আলাউদ্দীন যেন সমস্ত সৈন্য সামান্ত সরিয়ে দেন এবং পর্দার ব্যবস্থা করেন। পদ্মিনীর সঙ্গে অনেক দাসী থাকবে; তা ছাড়া আরো অনেক কিঙ্করী রাজার শিবিরে তাঁকে পৌঁছে দিতে আসবে। এভাবে সাতশো পাল্কী আলাউদ্দীনের শিবিরে প্রবেশ করলো। প্রতিটি পাল্কীর মধ্যে সশস্ত্র রাজপুত সৈন্য ছিলো। পাল্কীবাহকরা ছিলো ছদ্মবেশে সশস্ত্র সৈনিক। এভাবে সমস্ত পাল্কী শিবিরের মধ্যে নামলো। সুলতান মাত্র আধ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন পদ্মিনীর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎকারের। রাজাকে গোপনে পাল্কীতে ভরে রাজপুতগণ বেরিয়ে পড়লো। তখন সৈন্যদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ লাগলো। কিঙ্করীরূপে যে সৈন্যেরা এসেছিলো তারা আলাউদ্দীনের সৈন্যদেরকে বাধা দিতে লাগলো। আর এদিকে গোরা বাদলকে সঙ্গে নিয়ে ভীমসী চিতোর গড়ের দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে আলাউদ্দীনের হাতে গোরা নিহত হলো।

আলাউদ্দীন আবার ১৩৪৬ সংবতে চিতোর গড় আক্রমণ করলেন। এ যুদ্ধে রাণা ভীমসী তাঁর এগারো পুত্রের সঙ্গে নিহত হলেন। পদ্মিনী জহরব্রত করলেন। পদ্মিনীর সঙ্গে সহস্র রাজপুত ললনা সতী হলেন।"

টড মূলতঃ ইতিহাস লেখেননি। রাজপুতনার বিভিন্ন চারণ কবিদের গীতাবলী থেকে উপাখ্যান সংগ্রহ করেছেন। অল্পকিছু পরিবর্তন সহ একই বৃত্তান্ত

'আইন-ই-আকবরী'তে পাওয়া যায়। 'আইন-ই-আকবরী'তে ভীমসীর স্থানে রতনসীর নাম পাওয়া যায়। আলাউদ্দীনের দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণের ঘটনা 'আইন-ই-আকবরী'-তে ভিন্নরূপে আছে। সেখানে আছে যে, দ্বিতীয়বার যুদ্ধেও আলাউদ্দীন পরাজিত হলেন। সাতক্রোশ পথ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি রতনসীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। বারবার যুদ্ধে রতনসী ক্লান্ত ছিলেন। তাই মিলনের প্রস্তাব তিনি গ্রাহ্য করেলেন। কিন্তু মিলনের জন্য যখন তিনি এগিয়ে এলেন, তখন তাঁকে হত্যা করা হলো। আলাউদ্দীন চিতোর গড় অধিকার করলেন, কিন্তু পদ্মিনীকে পেলেন না। পদ্মিনী ইতিমধ্যেই সতী হয়েছেন।

'আইন-ই-আকবরী' পদ্মাবতের সমসাময়িক অথবা কিছুকাল পরের রচিত গ্রন্থ। বস্তুতঃ যে কাহিনী পদ্মাবতে আমরা পাই এবং যা চারণ কবিদের রচনা থেকে টড সংগ্রহ করেছিলেন এবং 'আইন-ই-আকবরী'-তে যার উপভোগ্য বর্ণনা আছে তার উৎস সম্ভবতঃ দলপতি-বিজয় রচিত 'খুমান রাসো'[২]। 'খুমান রাসো' গ্রন্থে রাজপুত বীরদের কাহিনী রাণা প্রতাপসিংহ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। টডের 'রাজস্থান', আবুল ফজলের 'আইন-ই আকবরী' এবং মহম্মদ কাসিম ফিরিশতার বর্ণনায় সর্বত্রই 'খুমান রাসো'র কাহিনী অল্পবিস্তর পরিবর্তন সহ গৃহীত হয়েছে।[৩] আলাউদ্দীন খিলজীর সমসাময়িক আমীর খুসরো, নিজামউদ্দীন, মওলানা উসামী এবং জিয়াউদ্দীন বরণী আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর আক্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আমীর খুসরো চিতোর আক্রমণের সময় বাদশার সঙ্গে ছিলেন। আমীর খুসরো তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন যে, ১১ই মহরম সোমবার ৭০৩ হিজরী সালে (১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ) আলাউদ্দীন চিতোর জয় করেন। জয়ের পর আলাউদ্দীন আপন পুত্র খিজির খানকে চিতোর অধিপতি করেন এবং চিতোরের নাম রাখেন 'খিজরাবাদ'।[৪] আমীর খুসরো, জিয়াউদ্দীন বরণী মওলানা উসামী ও নিজামউদ্দীন কেউ তাঁদের ইতিহাসে 'আলাউদ্দীন-পদ্মিনী' উপাখ্যানের উল্লেখ করেননি। যদি সত্যই পদ্মিনীর আকাঙ্ক্ষায় আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করতেন তাহলে সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তাগণ নিশ্চয়ই তার

উল্লেখ করতেন। আমীর খুসরো ছিলেন কবি। সুতরাং তাঁর পক্ষে আলাউদ্দীন-পদ্মিনীর প্রণয়োপাখ্যান অস্বীকার করার কোনো কথাই উঠতে পারে না। ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই, কারণ ঘটনাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। খুসরোর বর্ণনায় রত্নসেন নেই, গোরা নেই, বাদল বা পদ্মিনী নেই। জিয়াউদ্দীন বরণীর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমেণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাঁর লেখায়ও পদ্মিনীর উল্লেখ নেই। ৭৫১ হিজরীতে (১৩৫০ খ্রীঃ) রচিত মওলানা উসামীর 'ফুতুহুস্ সালাতীন' গ্রন্থেও পদ্মিনী অনুপস্থিত। সুতরাং পদ্মিনীর সম্পর্ক স্বপ্ন ও কল্পনার সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে নয়।

আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের সময় চিতোরের রাজা ছিলেন রত্নসেন, এটা ঐতিহাসিক সত্য। চিতোর রাজা মহারাণা কুম্ভকর্ণের রাজত্বকালে রচিত 'একলিঙ্গমাহাত্ম্য'[৫] গ্রন্থে রাজবর্ণন অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সমরসিংহের পর রত্নসেন মেবারের রাজা হন। সমর সেন সংবৎ ১৩৫৮ বিক্রম শতাব্দীর মাঘ মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন (১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী)। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের সময় হচ্ছে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস। ১৩৫৯ সংবতের মাঘমাসের তারিখযুক্ত রত্নসেনের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।[৬] এ কয়টি ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রত্নসেন এক বৎসর সাতমাস রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং এ অল্পসময়ের মধ্যে রত্নসেনের সিংহল-যাত্রা, পদ্মাবতী-লাভ আলাউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধ, কারাবাস, মুক্তি এত সমস্ত ঘটনা নির্বিবাদী কল্পনার ঔদার্যেই সম্ভবপর — বাস্তব জীবনে নয়।

'পদুমাবত' কাব্যের অনেক ঘটনা প্রচলিত রীতি-নির্ভর। যেমন, শুক পাখী। উত্তর ভারতে ভাটদের মুখে এবং চারণ কবিদের মধ্যে শুক পাখী নিয়ে বিচিত্র উপকথা প্রচলিত আছে। অযোধ্যায় প্রচলিত একটি উপাখ্যানের উল্লেখ সৈয়দ কলবে মুস্তফা[৭] করেছেন। গল্পটি এই :—

"রাজার প্রথম রাণী দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখছেন এবং তোতাকে জিজ্ঞেস করছেন—

'দেস দেস তো হিরে হৌ সুয়টা।
মোরে রূপ ঔর কহুঁ কোই॥"

অর্থাৎ—'হে শুক, তুমি অনেক দেশে ঘুরেছো কোথাও আমার মতো সুন্দর দ্বিতীয় কাউকে কি দেখেছো ?'

তোতা উত্তর করছে—

'কা বখানু সিংহল কী রাণী।
তোরে রূপ ভরৈঁ সব পানী ॥'

অর্থাৎ—'সিংহলের রাণীর কি বর্ণনা করবো! তোমার মতো রূপবতীরা সকলে পানি ভরে।'

চন্দ বরদাঈ রচিত 'পৃথ্বীরাজ রাসৌ' গ্রন্থে শুক পাখির উপাখ্যান আছে। সেখানে পৃথ্বীরাজ মহিষী পদ্মাবতীর প্রথম যৌবন, শুকের সঙ্গে কথোপকথন, শুকের দৌত্য এবং অবশেষে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তাঁর মিলনের সুন্দর বর্ণনা আছে।[৮] সংক্ষেপে কাহিনীটি নিম্নরূপ :—

"পূর্বদিকের গঢ় যা ছিলো সমুদ্র-শিখরের মতো দুর্গম তার রাজপদাধিকারী ছিলেন যাদব বংশী অভঙ্গবীর রাজা বিজয়সুর। ইনি অনেক সৈন্য হস্তী ঘোড়া তথা বিরাট প্রদেশের রাজা ছিলেন। তাঁর মর্যাদা ছিলো সমুদ্রের মতো স্থির। প্রবল বীরগণ তাঁর সেবা করতো। তাঁর দ্বারদেশে উচ্চৈঃস্বরে তুর্যধ্বনি হতো। তুর্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন পঞ্চস্বর বাজতো। দশ সহস্র ঘোড়া স্বর্ণ এবং মুক্তায় সুসজ্জিত থাকতো যার উপর অধিষ্ঠিত থাকতো অশ্বারোহীগণ। অগণিত হস্তী ছিলো এবং সৈন্য ছিলো অনেক। একজন ছিলো সেনানায়ক, যে ছিলো দ্বার রক্ষক। রাজার দশপুত্র এবং এক কন্যা ছিলো এবং সকলেই ছিলো রাজার সমান প্রিয়। গগনে অরুণ শিখরের মতো তাঁর সুরঙ্গ রথ ছিলো। রাজকুমারদের মধ্যে পদ্মসেন নামে এক রাজা অতি সুন্দর ছিলেন। কুমার পদ্মসেনের গৃহে যৌবনবতী স্ত্রী ছিলো, যার গর্ভে জন্ম নিলো চন্দ্র আর সূর্য-কলার মতো সুন্দরী কন্যা। সে কন্যার মুখকমল বিকশিত ছিলো, যেখানে শোভিত ছিলো সুন্দর ভ্রূযুগল। তার নেত্র ছিলো খঞ্জনের মতো। এই পদ্মাবতী ছিলো পদ্মিনী তুল্য, যাকে কামদেব নির্মাণ করেছিলেন। তার অঙ্গে সমস্ত সামুদ্রিক লক্ষণ এবং চৌষট্টি কলা শোভমান ছিলো। তার প্রেম ছিলো বসন্তের মতো মনোমোহন। সখীদের সঙ্গে সে রাজভবনের নিকটস্থ উদ্যানে খেলা করতো। উদ্যানে সে এক শুক দেখলো, যাকে দেখে তার মনে প্রসন্নতা

এলো। পদ্মাবতীর অরুণ অধর দেখে বিম্বফল বলে ভ্রম হলো শুকের। বিম্বফলরূপী অধরের স্পর্শ পাবার জন্য শুক যে মূহূর্তে নিকটে এলো, রাজকুমারীর হাতে সে বন্দী হলো। রাজকুমারী শুককে অনুপম মুক্তাখচিত পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করলো। শুককে পেয়ে রাজকুমারী ক্রীড়াকৌতুক ভুলে গেলো এবং অনুক্ষণ শুককে প্রসন্নতার সঙ্গে রাম নাম শেখাতে লাগলো। শুক রাজকুমারীর শরীরের শোভা পদনখ থেকে শিখর পর্যন্ত দেখে বিচার করলো যে বিধাতা আপন হাতে একে পদ্মিনীরূপী করেছেন। শিব-পার্বতীর প্রসাদে শুক জানতে পারলো যে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে এর মিলন ঘটবে। শুক ছিলো বিচিত্র পণ্ডিত। রাজকুমারীর সঙ্গে তার অনেক তত্ত্বালোচনা হতো। একদিন কুমারী জিজ্ঞেস করলো 'হে শুক, তুমি সত্য বলো তুমি কোন দেশ থেকে এসেছো এবং সে দেশের রাজার নাম কি?' শুক বললো 'হিন্দুস্তানে দিল্লী দুর্গ আছে। সেখানকার রাজা ইন্দ্রের সমান চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ। তিনি সোমেশ্বরের পুত্র সাক্ষাৎ কামদেবের অবতার।' পৃথ্বীরাজের নাম শুনে রাজকুমারীর চিত্তে চাঞ্চল্য এলো। রাজকুমারী শুককে বললো 'আমার শৈশবাবস্থা দূর হয়েছে এবং বসন্তের উৎসব আরম্ভ হয়েছে দেহে। তাই আমার পিতা এখন আমার পরিণয়ের ব্যবস্থা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজা উপযুক্ত বরের সন্ধানে দেশ বিদেশে লোক পাঠিয়েছেন এবং পুরোহিতকে বলেছেন যে সকল রাজার চেয়ে যে বড়ো এবং যে প্রকাণ্ড দুর্গের অধিশ্বর এবং যে শীলবান তার কাছেই তিনি কুমারী কন্যাকে সমর্পণ করবেন। পুরোহিত রাজাকে জানিয়েছে যে, লক্ষাধিক গ্রামের আধিপত্য যার সেই কমাউগঢ়ের রাজা কমোদনি রাজকন্যার উপযুক্ত বর। দ্বিজ আমাকে সে রাজার হাতে অর্পণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হে শুক, পৃথ্বীরাজের সঙ্গে আমার মিলন কি করে সম্ভবপর হবে তার যুক্তি দাও। তুমি শ্রেষ্ঠ বীর চৌহান রাজ পৃথ্বীরাজকে আমার বার্তা দাও এবং বলো যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে শ্বাস আছে ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথ্বীরাজই আমার প্রিয়।' মিলনের যোগ্য মুহূর্তের সংবাদ লিখে কুমারী শুককে পত্র দিলো। সেখানে আরো লিখলো 'আপনি যদি শুদ্ধ ক্ষত্রিয় হন, তাহলে আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার আগমনের অপেক্ষায় থাকবো। যে ভাবে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেছিলো সে ভাবেই আপনি আমাকে বরণ করুন।' পত্র নিয়ে শুক আকাশে উড়লো

শুক পৃথ্বীরাজের দরবারে উপস্থিত হলো এবং তাঁর হাতে পত্র দিলো। পৃথ্বীরাজ প্রসন্ন হলেন এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। পৃথ্বীরাজ রণবাদ্য বাজিয়ে সমস্ত সামন্তকে অহ্বান জানালেন। শ্রেষ্ঠ, সরস এবং অনুপম রূপক কাব্য যিনি রচনা করেন সেই কবিকেও তিনি সঙ্গে নিলেন। যেদিন পদ্মাবতীর পিতৃ-নির্বাচিত বর সমুদ্রশিখরে এলো সেদিন পৃথ্বীরাজও একই লগ্নে সেখানে উপস্থিত হলেন। ওদিকে পৃথ্বীরাজের সমুদ্রশিখর দেশে যাত্রার সংবাদ গজনীর রাজা শাহাবুদ্দীনের কানে পৌছলো। শাহাবুদ্দীন সৈন্যসামন্ত সুসজ্জিত করে পৃথ্বীরাজের প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁবু স্থাপন করলেন। এদিকে রাজা পৃথ্বীরাজ পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে আসছেন। পথে শাহাবুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। ভীষণ যুদ্ধ হলে। যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের জয় হলো। বাদশাহ বন্দী হলেন পৃথ্বীরাজের হাতে। গৌরী পদ্মাবতীকে বরণ করে এবং বাদশাহকে বন্দী করে চৌহান বংশজ পৃথ্বীরাজ দিল্লীর নিকটে পৌছলেন। অবশেষে—

"চঢ়ে রাজ দ্রুগ্ গহ নৃপতি সু মত রাজ পৃথিরাজ।
অতি অনন্দ আনন্দ সে হিন্দবান সিরতাজ॥'

গোরা ও বাদল কর্তৃক বাদশাহ আলাউদ্দীনের বন্দীশালা থেকে কৌশলে রত্নসেনের উদ্ধার শেরশাহের আমলের একটি ঘটনা থেকে নেয়া। শেরশাহ যখন বাংলা দেশ আক্রমণ করতে যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে রোহতাস দুর্গ ছিলো। তিনি কৌশলে দুর্গ জয় করেন। যুদ্ধ করে দুর্গ জয় করা সময়সাপেক্ষ বিবেচনা করে তিনি দুর্গাধিপতির নিকট প্রস্তাব করলেন যে তিনি তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ এবং অন্তঃপুরের রমণীগণকে রোহতাস দুর্গে রেখে যেতে চান। বঙ্গদেশ জয় করে ফেরবার পথে তিনি এদেরে সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং দুর্গাধিপতিকে পুরস্কৃত করবেন। দুর্গাধিপতি সম্মত হলে তিনি এক হাজার পাল্কীতে এক হাজার সশস্ত্র সিপাহী এবং দু'হাজার বাহক প্রেরণ করেন। দুর্গের মধ্যে যেয়ে সিপাহীগণ আত্মপ্রকাশ করে এবং অপেক্ষমান শেরশাহের জন্য দুর্গদ্বার উন্মোচন করে। এভাবে ৯৪৯ হিজরীতে (১৫৪২ খ্রীঃ) রোহতাস দুর্গের পতন হয়। ঘটনাটি 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'-য় বর্ণিত আছে।

মালিক মুহম্মদ জায়সী এই ঘটনাকে অবলম্বন করে গোরা ও বাদল কর্তৃক কৌশলে রত্নসেনের উদ্ধারের ঘটনা নির্মাণ করেছেন। 'পদ্মাবত' উপাখ্যানের শেষের দিকে 'গোরা-বাদল-যুদ্ধ খণ্ড' অধ্যায়ে এ বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :—

"মতৈঁ বৈঠি বাদল ঔ গোরা।
সো মত কীজ পরৈ নহিঁ ভোরা॥
পুরুষ ন জরহিঁ নারি-মতি কাঁচী।
জস নৌশাবা কীন্হ ন বাঁচী॥
পরা হাত ইসকন্দর বৈরী।
সো কিত ছোড়ি কৈ ভঈ বঁদেরী?
সুবুধি সেঁা সসা সিংঘ কহঁ মারা।
কুবুধি সিংঘ কূআঁ পরি হারা॥
দেবহি ছরা আই অস আঁটী।
সজ্জন কঞ্চন দুর্জন মাটী॥
কঞ্চন জুরৈ ভএ দস খণ্ডা।
ফুটি ন মিলৈ কাঁচ কর ভণ্ডা॥
জস তুরকন্হ রাজা ছর সাজা।
তস হম সাজি ছোড়াবহিঁ রাজা॥
পুরুষ তঁহা পৈঁ করৈ ছর জহঁ কর কিএ ন আঁট।
জহাঁ ফূল তহঁ ফূল হৈ জহাঁ কাঁট তহঁ কাঁট॥

অর্থাৎ — 'মন্ত্রণার জন্য বসলো বাদল এবং গোরা; এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ত্রুটি না থাকে। নারীর মতো অপরিস্ফুট কাজ পুরুষ করবে না; যেমন নওশবা[৯] আপনাকে রক্ষা করতে পারলো না। সিকান্দার তার হাতে পড়েছিলো কিন্তু সে কেন তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই বন্দিনী হলো? সুবুদ্ধি ছিলো বলে শশক সিংহকে মেরেছিলো, কিন্তু কুবুদ্ধির কারণে সিংহ কূপে পড়লো এবং পরাজিত হলো।[১০] নিজে এসে যখন ধরা দিয়েছেন, তখনও বাদশাহ রাজার সঙ্গে ছলনা করলেন। সজ্জন হচ্ছে কাঞ্চনতুল্য, কিন্তু দুর্জন হচ্ছে মাটি। কাঞ্চন দশখণ্ড হলেও তাকে জোড়া যায় কিন্তু মাটির পাত্র টুকরো

হলে জোড়া লাগেনা। যেভাবে তুর্কীরা রাজার সঙ্গে ছলনা করেছিলো, আমরা তেমনি ষড়যন্ত্র করে রাজাকে মুক্ত করবো। পুরুষ তখনই ছলনার সহায়তা নেবে যখন সে শক্তি-প্রয়োগে সিদ্ধিলাভে অসমর্থ। যেখানে ফুল আছে সেখানে ফুল থাকবে, এবং যেখানে কাঁটা আছে সেখানে কাঁটা।'

"সোরহ সৈ চণ্ডোল[১১] সঁবারে।
কঁবর সজোইল কৈ বৈঠারে[১২] ॥
পদমাবতী কর সজা[১৩] বিবানূ।
বৈঠ লোহার ন জানৈ ভানূ ॥
রচি বিবান সো[১৪] সাজি সঁবারা।
চহুঁ দিশি চঁবর করহিঁ সব চারা ॥[১৫]
সাজি সৈব চণ্ডোল[১৬] চলা এ।
সুরঁগ ঔহার মোতি বহু লাএ ॥
ভএ সঁগ গোরা বাদল বলী।
কহত চলে[১৭] পদমাবতী চলী ॥
হীরা রতন পদারথ ঝুলহিঁ।
দেখি বিবান দেবতা ভূলহিঁ ॥
সোরহ সৈ সঁগ চলীঁ সাহেলী।[১৮]
কঁবল ন রহা ঔর কো বেলী ॥
রাজহি চলীঁ ছোড়াবৈ রাণী হোই ওল।[১৯]
তীস সহস তুরি খিঁচী সঁগ সৌরহ সৈ চণ্ডোল ॥"

অর্থাৎ — 'ষোলশত পাল্কী সাজলো, সুসজ্জিত হয়ে রাজপুত বীরগণ তার মধ্যে বসলো। পদ্মাবতীর বিমান সজ্জিত হলো। তার মধ্যে এমনভাবে বসলো একজন লোহার যে সূর্যও সে-সংবাদ জানলোনা। বিমান সজ্জিত হলো। চামর দুললো তার চতুর্দিকে। এ ভাবে সুসজ্জিত পাল্কী চললো। সুন্দর আচ্ছাদন ছিলো মুক্তা-খচিত। সঙ্গে চললো গোরা ও বাদল। তারা বলতে লাগলো যে পদ্মাবতী যাত্রা করেছেন। পাল্কী থেকে ঝুলছিলো হীরা ও বহুমূল্য রত্নসজ্জা। বিমান দেখে দেবতারাও মোহগ্রস্থ হলেন। সঙ্গে চললো ষোলশত সখী। কমল যেখানে রইলোনা, সেখানে বেলফুল কেন থাকবে? (অর্থাৎ

পদ্মাবতী যখন যাচ্ছে বাদশার কাছে, তখন তার সখীরা কেন চিতোরে বসে থাকবে? সখীরা ছিলো প্রকৃত প্রস্তাবে ছদ্মবেশী সৈনিক)। রাজাকে দেখবার-জন্য রাণী বাদশার কাছে ধরা দিতে চললেন। তিরিশ হাজার ঘোড়া চললো ষোল শত পাল্কীর সঙ্গে।'

'পদুমাবত' কাব্যে জায়সী ছদ্মবেশী সৈনিক কর্তৃক রত্নসেনের উদ্ধারের বর্ণনা বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। কুম্ভলনেরের রাজা দেবপালের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক সরজা তুর্ক ও কাল্পনিক ব্যক্তি।[২০] জায়সীর কাব্যের গোরা ও বাদল পিতা-পুত্র। আলাউদ্দীনের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ গোরা ও বাদলের উল্লেখ করেননি।[২১] সৈয়দ কল্‌বে মুস্তফা উদয়পুরের একলিঙ্গজীর মন্দিরের শিলালিপির উল্লেখ করেছেন।[২২] শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে যে সংবৎ ১৫৪৫ বা ১৪৮৮ খ্রীঃ বাদল গোরা নামক এক রাজপুত সরদার মাণ্ডুর সুলতান গিয়াসুউদ্দীন খিলজীকে পরাস্ত করেন এবং বহু শত মুসলমানকে হত্যা করেন। যেখানে তারা নিহত হন সেখানে 'বাদলশৃঙ্গ' নামে একটি দুর্গ-শীর্ষ নির্মিত হয়েছে। রাজপুতবীরের নাম ছিলো বাদল, গোরা ছিল তার গোত্রের নাম।[২৩] মাণ্ডুর সুলতান গিয়াসুদ্দীন খল্‌জীর কাহিনী 'তারাখে-ই-ফিরিশতা'য় বর্ণিত আছে। সুলতান ছিলেন বিলাসী এবং কাম-চতুর নাগরিক। সুন্দরী রমণী সংগ্রহ করে তাদের বাসস্থানের জন্য হুসনাবাদ নামে এক নগর নির্মাণ করেছিলেন। পদ্মিনী-রমণী সংগ্রহের জন্য তিনি দেশ-বিদেশে লোক পাঠিয়েছিলেন। সৈয়দ কলবে মোস্তফা ধারণা করেছেন যে সম্ভবতঃ খল্‌জীর কাহিনীই রত্নসেনের পদ্মিনী-লাভ কাহিনীর উৎস।[২৪] ধারণাটি আমার কাছে ভিত্তিহীন মনে হয়, কেননা বিলাসী নৃপতিদের সুন্দরী রমণী-সন্ধান মধ্যযুগের একটি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু রত্নসেনের সিংহল যাত্রা ও পদ্মিনী-লাভ একটি বিশিষ্ট ঘটনা। উভয়ের মধ্যে তাই তুলনা চলেনা। তেমনি পদ্মিনীর জহরব্রত উদ্‌যাপনের কাহিনী একটি বিশেষ প্রথার পরিচয়সূত্রে এসেছে। তাই এ কাহিনীটি তৎকালীন অথবা পূর্বতন বিভিন্ন সতী-কাহিনীর সমান্তরাল কিন্তু অণুকরণ নয়। সুতরাং সৈয়দ কল্‌বে মোস্তফার[২৫] এ সিদ্ধান্তও সত্য নয় যে মুহম্মদ তুগলুকের হাতে পরাজিত রাজা খেলার সমস্ত রাণীদের

জহরব্রত উদ্‌যাপনের কাহিনী পদ্মিনীর জহরব্রত কাহিনীর উৎস। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে রাজপুত নৃপতিগণ গড়ের মধ্যে চিতা প্রজ্জ্বলন্ত রেখে যেতেন। পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে রমণীকুল তার মধ্যে আত্মাহুতি দিতো।[২৬]

'আলাউদ্দীন-পদ্মিনী'র কাহিনী পরবর্তীকালে যে রূপ নিয়েছে তা কৌতূহলজনক। জাহাঙ্গীরের সময় ১৭শ শতকে মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা তাঁর বর্ণনায় চিতোর আক্রমণের নিম্নরূপ কাহিনী দিয়েছেন :

> "চিতোরের রাজা আলাউদ্দীনের হাতে যখন বন্দী, সে সময় সুলতান রাজার এক কন্যার রূপলাবণ্যের খ্যাতি শুনলেন। সুলতান রাজাকে বললেন যে, যদি রাজা তাঁর কন্যাকে সুলতানের অন্তঃপুরে প্রেরণ করেন তাহলে তাঁর মুক্তি ঘটবে। রাজা স্বীকৃত হলেন এবং কন্যার নিকট প্রস্তাব পাঠালেন। রাজ পরিবারের সকলে এহেন অসম্মানজনক প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হলো এবং রাজাকে গোপনে বিষপ্রয়োগে হত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু রাজার কন্যা পিতাকে মুক্ত করবার গোপন আয়োজন করলো। পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলে সুলতানের নিকট প্রস্তাব পাঠালো। সুলতান রাজী হলেন। অনুচর সঙ্গে নিয়ে কন্যা পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলো এবং কৌশলে পিতাকে মুক্ত করলো।"

ফিরিশতার কাহিনীতে নতুন কিংবদন্তী যুক্ত হয়েছে। পদ্মিনীর পরিবর্তে তিনি রাজার কন্যার কথা লিখেছেন।

সুন্দরী রমণীদের প্রতি আসক্তি আলাউদ্দীনের ছিলো। ফিরিশতায় বর্ণিত আছে যে, ৬৯৭ হিজরীতে আলাউদ্দীনের দুজন সেনাপতি ইলিচ খান ও নসরত খান গুজরাট দখল করেন। পরাজিত হয়ে গুজরাটের রাজা কর্ণ পলায়ন করেন। কর্ণের পত্নী কমলা দেবী রাজদরবারে আনীত হলেন। আলাউদ্দীন তাঁর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাঁকে আপন পত্নী করলেন। কমলাদেবীর এক কন্যা ছিলো, যার নাম ছিলো দেবলা দেবী। কয়েক বছর পর দেবলা দেবীও বন্দিনী হয়ে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খানের সঙ্গে তার প্রণয় হয় এবং পরে তাদের বিবাহ হয়। খিজির খান ও দেবলা দেবীর প্রণয়ের বিবরণ আমীর খুসরোর কাব্যে বর্ণিত আছে।

তবে ইতিহাসের ছায়া থাকলেও মূলতঃ পদ্মিনী উপাখ্যান ইতিহাস নির্ভর নয়। উপন্যাসের রহস্য, রোমাঞ্চ এবং কৌতূহলের জন্য ইতিহাসাশ্রিত বিভিন্ন ঘটনা নির্মিত হয়েছে। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠা নয়, বরঞ্চ ঐতিহাসিক তাৎপর্যের মধ্যে একটি প্রণয়োপাখ্যানকে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করা। কাব্যের উপসংহারে কবি লিখেছেন :

> "আমি পণ্ডিতগণকে এ কাহিনীর তাৎপর্য জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা বলেছেন যে, সৃষ্টিতে যে চতুর্দশ ভুবন আছে তার সব কয়টি মানুষের দেহের মধ্যে। তনুকে করেছি চিতোর, মনকে করেছি রাজা। হৃদয়কে করেছি সিংহল এবং বুদ্ধিকে চিনেছি পদ্মিনী বলে। গুরু হচ্ছে শুক, যে পথ দেখিয়েছে; গুরু ব্যতিরেকেনির্গুণকে মানুষ কি করে পাবে ? নাগমতি হচ্ছে এ পৃথিবীর বিপদ-বাঁধা। যার চিত্ত সেখানে আবদ্ধ তার মুক্তি নেই। দূত রাঘব হচ্ছে শয়তান এবং সুলতান আলাউদ্দীন হচ্ছেন মায়া। প্রেম কাহিনীকে এ ভাবেই বিচার করতে হবে। যার জ্ঞান আছে সে-ই এ তত্ত্ব বুঝতে পারবে। তুর্কী, আরবী, হিন্দী ইত্যাদি যত প্রকার ভাষা আছে সব ভাষাতেই প্রণয়ের রহস্য বর্ণিত হয়েছে।"[২৭]

কবির এই উক্তিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিচিত্র উপায়ে প্রণয়ের রসাবেস সৃষ্টি করাই ছিলো তাঁর লক্ষ্য এবং ইতিহাস তাঁর প্রণয়-কাহিনীতে স্বাদ এবং আনন্দ দিয়েছে।

'পদুমাবত'-এর রূপক সংক্রান্ত স্তবকটি একমাত্র রামচন্দ্র শুক্লের সম্পাদিত পাঠে পাওয়া যায়। যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমি পরীক্ষা করেছি, যেমন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত S2471, P1819, P3130, P1018, P1975 এর কোনো একটিতেও এ স্তবকটি নেই। P1018 পাণ্ডুলিপির শেষে পরবর্তীকালের সংযোজিত অনেকগুলি স্তবক আছে কিন্তু এখানেও এ স্তবকটি পাওয়া যায় না। মানের শরিফ খানকার পাণ্ডুলিপির শেষাংশ নেই। এভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তত্ত্বসংক্রান্ত স্তবকটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া কাব্যের শেষের দুটি স্তবকের অব্যবহিত পূর্বে রূপক-ব্যাখ্যা একটু অসমীচীন মনে হয়। কাব্য শেষে কবি বলছেন :

"কবি মোহাম্মদ এ কাহিনী রচনা করে সকলকে শুনিয়েছেন। যে শুনেছেসে প্রেমে পীড়িত হয়েছে। রচনার সময় তিনি এর ছত্রে ছত্রে রক্তের প্রলেপ লাগিয়েছেন এবং নয়নের জলকে করেছেন প্রীতির প্রসাদ। আমি এ আশায় এ গান রচনা করেছি যেনো পৃথিবীতে এটা চিহ্ন হিসেবে বর্তমান থাকে। রত্নসেন, যিনি রাজা ছিলেন তিনি আজ কোথায়? বুদ্ধিতে পারদর্শী কোথায় সেই শুক পাখী? কোথায় আলাউদ্দীন সুলতান? কোথায় রাঘব, যে পদ্মিনীর সংবাদ দিয়েছিলো? কোথায় সেই সুন্দরী পদ্মাবতী রাণী? কেউ নেই, জগতে তাদের কাহিনী আছে। ধন্য সেই যার কীর্তি জাগরিত থাকে। ফুল মরে যায় কিন্তু সুগন্ধ নষ্ট হয় না। পৃথিবীতে গৌরব বিক্রয় করা যায় না, গৌরব ক্রয় করবার ক্ষমতাও কারো নেই। এ কাহিনী যে পড়বে সে যেনো আমার কথা ভাবে এবং আমার জন্য প্রার্থনা করে।"

"যখন মোহাম্মদের বার্ধক্য এলো, তখন তাঁর যৌবন অন্তরালে গেলো এবং যৌবনের অবস্থা তাঁর রইলো না। সামর্থ গেলো এবং শরীর ক্ষীণ হলো। দৃষ্টি গেলো, নয়নে রইলো শুধু পানি। দশন গেলো, কপোলকে শীর্ণ করে। বাণী নষ্ট হলো এবং কণ্ঠস্বর হলো অপ্রীতিকর। বুদ্ধি গেলো এবং হলো উন্মাদের মতো। গর্ব গেলো এবং আনত হলো শির। শ্রবণশক্তি নষ্ট হলো। কেশের কৃষ্ণবর্ণ গেলো এবং কেশ হলো তুলার মতো। ভ্রমর চলে গেলো. রইলো শুধু রেশম সদৃশ শুভ্রকেশ। যৌবন গেলো তার জ্যোতিঃ নিয়ে। জীবন ততক্ষণ পর্যন্তই জীবন, যতক্ষণ সেখানে যৌবন থাকে। এর পরের জীবন পরহস্তগত এবং মৃত্যুতে মলিন। বৃদ্ধ যখন শির সঞ্চালন করে তখন আপন অসহায় অবস্থা ভেবে সে ক্ষোভ প্রকাশ করে। 'তোমার বার্ধক্য আসুক' এমন অভিশাপ কে দিয়েছিলো?"

দেখা যাচ্ছে যে কবি একটি প্রণয়োপাখ্যান বর্ণনা করেছেন এবং যুগ যুগ ধরে তা সকলের স্মরণে থাকুক এই তিনি চান। সম্পূর্ণ কাহিনী পাঠ করলে এটা স্পষ্ট জানা যায় যে, আখ্যায়িকাটি মূলতঃ একটা প্রেম কাহিনী। কবি এ কাব্যে দাম্পত্য প্রণয় বর্ণনা করেননি যদিও বিবাহ-লগ্নের শেষে মিলিত সংসারের উল্লেখ আছে। রামায়ণে বিবাহ সম্পর্কের পূর্ণ উৎকর্ষ, আনন্দ এবং স্থিতি দেখানো হয়েছে। দাম্পত্যজীবনে পারস্পরিক প্রেমের যে আনন্দময় উজ্জীবন তার শুদ্ধ, নির্মল এবং স্বাভাবিক চিত্র আমরা রামায়ণে পাই যেখানে দাম্পত্য প্রেম বর্ণিত হয় সেখানে নায়ক পক্ষকে কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হয়

এবং নায়িকার চিত্তে থাকে নির্ভরতা ও শান্তি। রামায়ণে সমস্ত কর্মের দায়িত্ব রামের। সীতা তাঁর গৃহিনী এবং নর্ম-সহচরী।

সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা নরনারীর প্রেমের পরিচয় পাই, যে প্রেম বিবাহ-পূর্ব এবং বিবাহ যার ফলস্বরূপ। এখানে নায়ক নায়িকা উপবনে, নদীতটে, বন-বীথিতে একে অন্যের সাথে পরিচিত হয় এবং উভয়ের চিত্তে প্রীতি জাগে। নায়িকাকে পাবার জন্য নায়ক বহুবিধ যত্ন করে। এ সময়ে উভয়ের মধ্যে সংযোগ এবং বিপ্রলম্ভের অবকাশ থাকে। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ এ সমস্ত কাহিনীর ইতি ঘটে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' এবং 'বিক্রমোর্ব্বশী' কব্যে এ প্রকার বিবাহ-পূর্ব প্রণয়ের বর্ণনা আছে। রাজা-মহারাজাদের অন্তঃপুরের উদ্যানে অথবা বাপীতটে ভোগ বিলাসের আনন্দের মধ্যেও কখনো কখনো প্রণয় কাহিনীর উন্মেষ ঘটে। 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা', 'কর্পূরমঞ্জরী' ইত্যাদি কাব্যে এই প্রকৃতির প্রেমের বর্ণনা আছে।

কিন্তু যে প্রেম জাগ্রত হয় গুণ শ্রবণ করে, চিত্রদর্শন করে এবং স্বপ্নের আকুলতায় এবং তারপর নায়ক নায়িকা সংযোগ-শৃঙ্গারের জন্য আকুল হয়, 'পদুমাবত' কাব্যে সেই প্রেমই বর্ণিত হয়েছে। জায়সী তাঁর কাব্যে নায়িকার গুণ শ্রবণের পর নায়কচিত্তের ব্যাকুলতা বর্ণনা করেছেন। নায়ক অসম্ভব বিপদ বাধা অতিক্রম করে নায়িকাকে আবিষ্কার করলো। মন্দিরে প্রথম সাক্ষাতে প্রণয়াকর্ষণের তীব্রতায় মুহ্যমান নায়ক হতচেতন হলো। অবশেষে অনেক সঙ্কট ও চিত্তদাহনের পর নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটলো। বেদনা ও বিরহের আধিক্যে নায়ক দিন দিন ক্ষীণ হয়েছে, বিরহতাপে দগ্ধীভূত হয়েছে। মধ্যযুগের হিন্দী কাব্যে বিভিন্ন প্রণয়োপাখ্যানে এর পরিচয় আমরা দেখতে পাই। জায়সী তাঁর কাব্যের নায়ককে অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। তাঁর প্রেম চিত্তবৃত্তির আশ্রয়ে মানসিক, অনবরত শৃঙ্গার-কামনায় শারীরিক নয়। তিনি প্রেমের এই মানস-নির্ভরতা ফার্সী কাহিনী 'লায়লা-মজনু', 'শিরি-ফরহাদ' থেকে পেয়েছেন। ফার্সী কাব্যে নায়কের প্রেম তীব্রতর, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে নায়িকার প্রেম তীব্রতর। জায়সী অবশ্য পদ্মাবতীর-অনুসরণের মধ্যে নায়ক পক্ষকে প্রধান করেছেন; আবার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে বিরহতাপে পীড়িত নাগমতির অনুধ্যানে

স্ত্রীপক্ষকে প্রধান করেছেন। নাগমতির বিরহ বর্ণনায় কবি ষট্‌ঋতু বর্ণন করেছেন। ফার্সী কাব্যে প্রেম সংসার-চেতনা থেকে মুক্ত একটি ঐকান্তিক ধ্যানের মতো। সাংসারিক পরিস্থিতির বাইরে এর একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। পৃথিবীতে মানুষের ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত সম্পদ আছে এবং যে সব সম্পদ থেকে লোক-কর্তব্যের আদর্শ নির্মিত হয়, ফার্সী কাব্যে তার পরিচয় নেই। সেখানে আমরা প্রেমোন্মাদ নায়কের একটি আদর্শভিত্তিক প্রণয়নিষ্ঠার পরিচয় পাই। কিন্তু জায়সীর 'পদ্মাবতে' ফার্সী মসনভী বা আখ্যায়িকার প্রভাব থাকলেও তাঁর কাহিনীটি লোকপক্ষ শূন্য হয়নি। রাজা যোগী হয়ে গৃহত্যাগ করছেন এবং ঠিক তখনই তাঁর মাতা এবং রাণী পথরুদ্ধ করে দাঁড়াচ্ছেন। আবার সিংহলে শৃঙ্গার-সংযোগে রসরঙ্গের পর বিদায়ের সময় যখন এলো তখন সখিগণ এবং পরিজনবর্গ ব্যথিত হচ্ছে। রাঘবচেতন যখন বহিষ্কৃত হলো তখন পদ্মাবতী রাজা এবং রাজ্যের অমঙ্গল অশঙ্কায় ব্রাহ্মণের সন্তুষ্টির জন্য করের কঙ্কণ দান করছেন। এভাবে কাহিনীতে একটি লোক-নির্ভরতা এসেছে। আদর্শ প্রেমের অনুধ্যান এবং অনুসরণ কোথাও ব্যাহত হয়নি কিন্তু পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন থেকেও সে প্রেম বিচ্ছিন্ন থাকেনি। এভাবে কবি প্রেমের ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা, ত্যাগ এবং তিতিক্ষার সঙ্গে সপত্নীকলহ, মাতৃস্নেহ, স্বামীভক্তি, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি লৌকিক তাৎপর্য-পূর্ণ ঘটনারও বর্ণনা দিয়েছেন। আলাউদ্দীনও পদ্মিনীকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। রাঘবচেতনের মুখে পদ্মিনীর রূপ-ব্যাখ্যা শুনে তাঁর চিত্তদাহ উপস্থিত হয়েছিলো এবং পদ্মিনী লাভের জন্য যে কোলাহল তুলেছিলেন তাতে প্রেমের উচ্চারণ ছিলো না। আদর্শ প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য আলাউদ্দীনের কামনার বিরোধাভাষ এবং ব্যতিরেক সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো। তুল্যানুরাগ দ্বারা সমর্থিত হয়ে আদর্শ প্রেমের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। ইতিহাস এসেছে ছায়ায় এবং আভাসে স্বপ্নসঞ্চয়ের মতো। তত্ত্ব-এবং রূপকের ব্যঞ্জনাকে যদি আমরা প্রাধান্য না দিই তাহলে গ্রন্থের তাৎপর্য-নির্ধারণে কোনো অসুবিধা হয় না। তার কারণ হলো এ কাব্যের প্রতিপাদ্য হচ্ছে প্রেম এবং সে প্রেম শুধুমাত্র কোনো এক পক্ষের নয়; সে প্রেম সকল পক্ষের এবং সর্বরূপের। সুফি সাধকদের ঈশ্বরানুরাগ কবির বিভিন্ন

উক্তির মধ্যে ধরা পড়েছে। সেখানকার প্রেমের তাৎপর্য আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মনিবেদনের মধ্যে। আবার নরনারীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় উভয় পক্ষের সমতুল্য আকর্ষণের মধ্যে কবি আদর্শ প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। লৌকিক প্রেমের পরিচয় ফুটেছে গার্হস্থ্য-বন্ধন এবং সংসার-নির্বাহের মধ্যে। প্রেমের যে তুল্যানুরাগের কথা বললাম সংস্কৃত সাহিত্যে তার কিছু নিদর্শন দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ 'বিক্রমোর্বশী' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"তুল্যানুরাগ পিশুনং ললিতার্থবন্ধং পত্রে নিবেশিত মুদাহরণং প্রিয়ায়াঃ ॥
উৎপক্ষলং, মম সখে ! মদিরেক্ষনায়াস্তস্যাঃ সমাগতাবিমাননমাননেন ॥"

রাজা দুষ্মন্তের নিকট বিদূষক যখন মনস্থির করবার কথা বলেছিলেন — তখন রাজা বলেছিলেন 'সখে, প্রিয়তমার এ পত্র পেয়ে আমার মনে হচ্ছে যে মত্ত খঞ্জনাক্ষী উর্বশীর সেই কমলনিন্দিত মুখখানির সঙ্গে যেনো আমার মুখ এতদিনে মিলিত হলো। কেন না এ পত্রে সবই আছে। আমি যেমন তার জন্য. সেও তেমনি আমার জন্য কাতর, আমার মনে যেমন যেমন ভাবের উদয় হয়, তার মনেও ঠিক তেমন তেমন ভাব বাসনার উদয় হয়ে থাকে। সে যে কি অবস্থায় আছে, তা সকলই তো সুন্দর করে এই চিঠিতে খুলে দিয়েছে। তাই মনে হচ্ছে যে, এ তো চিঠি নয়; এ যেনো তারই সেই মুখখানি, — তৃষিত আমি, আমার মুখের সঙ্গে এসে মিললো।

এ-ভাবে উপাখ্যানের উৎস সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে আমরা এ-সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে জায়সী প্রচলিত কাহিনী অনুসরণ করেছিলেন, যে কাহিনী তিনি ভাটমুখে শুনেছিলেন এবং প্রাচীন রাসো জাতীয় কাব্যে পাঠ করেছিলেন। এভাবে অবলম্বিত উপাখ্যানকে মনোহর কল্পনায় সজ্জিত করে তাকে সুন্দর করেছিলেন। সে সঙ্গে প্রেমের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ছিলো কবিচিত্তের একমাত্র তৃপ্তি।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্[২৮], পদ্মাবতী উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের সূত্র ধ'রেই আমি পদুমাবত উপখ্যানের উৎস সন্ধান ক'রেছি। আমার আলোচনায় আমি তাঁর নিকট ঋণী।

॥ টিকা ॥

১. Annals and Antiquities of Rajsthan by James Todd (Calcutta, Published by Harimohan Mookerjee, 1877; Second edition: Page 202—204).

২. মালিক মুহম্মদ জায়সী ·· ··· ··· সৈয়দ কলবে মুস্তফা "আঞ্জুমান-ই-তরক্কি--ই-উরদূ"— দিল্লী, ১৯৪১; পৃঃ ১০৪।

'হিন্দী সাহিত্যকা অতীত' — বিশ্বনাথ প্রসাদ মিশ্র। বাণীবিতান প্রকাশন, বারাণসী: ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৭।

'হিন্দী সাহিত্যকা রূপরেখা'— কৃষ্ণদেব প্রসাদ গৌড়। বিদ্যামন্দির, কানপুর, ১৯৬২; পৃঃ ২—৩।

৩. সৈয়দ কলবে মুস্তফা; পূর্বোক্ত।

৪. সৈয়দ কলবে মুস্তফা: পূর্বোক্ত; পৃঃ ১০৫।

৫. কালিকারঞ্জন কানুনগো কর্তৃক "পদ্মাবত কাব্য এবং পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা" প্রবন্ধে (প্রবাসী — বৈশাখ, ১৩৩৯) মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝাকৃত "রাজপুতানেকা ইতিহাস (২য় ভাগ— পৃঃ ৪৮৪) থেকে উদ্ধৃত।

৬. কালিকারঞ্জন কানুনগো: পূর্বোক্ত।

৭. সৈয়দ কল্‌বে মুস্তফা: পূর্বোক্ত; পৃঃ ১০০ (পাদটীকা)।

৮. "পৃথ্বীরাজ-রাসৌ" — প্রথম ভাগ। সম্পাদক—কবিরাজ মোহন সিংহ; প্রকাশক—সাহিত্য সংস্থান, রাজস্থান বিশ্ব বিদ্যাপীঠ, উদয়পুর; প্রথম সংস্করণ, সংবৎ ২০১১; পৃঃ ৩৫৪—৩৬৮।

৯. নিযামীর 'সিকান্দার নামা'য় বর্ণিত 'নওশাবা-সিকান্দারের উপাখ্যান'। সিকান্দার গোপনে ছদ্মবেশে নওশাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। নওশাবা চিনতে পেরেও তাঁকে বন্দী করেননি। পরে সিকান্দার সুযোগ বুঝে নওশাবাকে বন্দিনী করেছিলেন।

১০. পঞ্চতন্ত্রের গল্প।

১১. চৌভোল (মা)।

১২. বৈসারে (মা)।

১৩. সজা পদমাবত কর বিবানূ (মা)।

১৪. তস (মা)।

১৫. চবঁব করাহিঁ চহুঁ দিসি সবধারা (মা)।

১৬. চৌডোল (মা)।

১৭. জাই (মা)।

১৮. ষোলশত সখীকে ছদ্মবেশী সৈন্য হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। A. G. Shirreff এ-পাঠকে ভুল মনে করেছেন। পদ্মাবতীর সখীরা সত্যিই চৌডোলার সঙ্গে গিয়েছিলো, এ-অবস্থা কল্পনা করে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। মানের শরীফের পাণ্ডুলিপি এবং ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে (Hindi Cl—S2471) ষোলশত সখীর কথাই আছে। সখীরা প্রকৃত প্রাস্তবে নারীবেশী সৈনিক।

১৯. রাণী চলী ছোড়াবৈ রাজহিঁ আপু হোই তেহি ওল (মা. এবং S2471)।

২০. কালিকারঞ্জন কানুনগো : পূর্বোক্ত।

২১. ঐ।

২২. সৈয়দ কলবে মুস্তফা :

২৩. ঐ—পাদটীকা ১।

২৪. ঐ—পৃষ্ঠা ১১৬।

২৫. ঐ—পৃষ্ঠা ১১৭।

২৬. রামচন্দ্র শুক্ল : জায়সী গ্রান্থবলী. নাগরী প্রচারিণী সভা ; বারাণসী, ৪র্থ সংস্করণ, সংবৎ ২০১৭ বিক্রমাব্দ। মূল পাঠের ২২৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা।
A. G. Shirreff : Bibliotheca Indica, Work No 267. The Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta 1944. পৃ: ২৯৩, পাদটীকা (ff)।

২৭. শুক্ল : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০১।

২৮. পদ্মাবতী : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত ; প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৫০।